দৈনিক আমাদের সময়
31 MAY 2017

রায়হান আহমেদ

বিদ্যালয় হোক আনন্দের স্থান

আমরা কি পেরেছি স্কুলগুলোকে শিশুদের উপযোগী করে সাজাতে? এখনো দেশের সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাই নিশ্চিত নয়, তা ছাড়া যা আছে তাতেও নেই আনন্দের স্থান, আছে শুধু বোঝা, যা শিশুদের জন্য মোটেও আকর্ষণীয় নয়। এই ব্যর্থতা সব প্রজন্মসহ বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত প্রতিক্ষণ অনুভব করে। ভাবতে অবাক লাগে বর্তমান উন্নত বিশ্বে আমাদের সন্তানরা আজও সেই পেছনে পড়ে আছে। আর তাই তো বোঝা ও চাপের মুখে শিশুরা শিক্ষাকে ভয় পেয়ে অকালেই ঝরে পড়ে। শিশুরা আনন্দ করতে ভালোবাসে এটাই সত্য। কিন্তু আমাদের স্কুলগুলোয় আজও শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক করে তুলতে পারিনি বিধায় শিশুরা স্কুলে আসতে অনীহা ও অমনোযোগী। শিশুকে স্কুলে ভর্তির মানেই হলো প্রতিনিয়ত পরীক্ষা আর মানসিক চাপের মধ্যে ফেলা। শিশু শ্রেণি থেকে শুরু করে প্রতিটি শ্রেণিতে শিশুকে অংশ নিতে হয় বিভিন্ন পর্বের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়। একটি পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই আরেকটি পরীক্ষার সূচি ঘোষণা হয়ে যায়। পরীক্ষার এই বোঝা মাথায় নিয়ে ভীত এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শিশু শিক্ষার্থীরা। শিশুদের এই আতঙ্কের সঙ্গে যোগ হয় অভিভাবক এবং শিক্ষকদের অসুস্থ মানসিক প্রতিযোগিতা। শিশুদের শুধু অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাই নয়, পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষার নামে একটি বৃহৎ পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এই পরীক্ষা বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য, গত বছর এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২৭ লাখ শিশু। আর এই বৃহৎ পরীক্ষায় পাস করা বা ভালো ফল করার প্রতিযোগিতার পাশাপাশি শিশুদের প্রচণ্ড আকারে মানসিক দুশ্চিন্তাও শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় প্রতিনিয়ত প্রশ্নফাঁসের বিষয়টিও শিশুদের শঙ্কার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে শিশুর ওপর সৃষ্টি হওয়া এসব মানসিক চাপ শিশুর মানসিক বিকাশের পথে চরম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ করা যায়, শিশুদের ভালো ফল করার লক্ষ্যে অভিভাবক ও বিদ্যালয়গুলোর একযোগে প্রতিযোগিতা চলে। যে কোনোভাবেই নিজ নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অন্য বিদ্যালয় থেকে অধিক ভালো ফল করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন শিক্ষকরা। অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রতিযোগিতায় নানাবিধ অসদুপায় অবলম্বন করতেও দ্বিধা করেন না তারা। এ ক্ষেত্রে মূল ক্লাস বাদ দিয়ে স্কুলগুলোয় শুরু হয় কোচিংয়ের নামে বাড়তি পড়াশোনা এবং অনবরত শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্যের উৎসব; যদিও পাঠ্যক্রমে সৃজনশীলতা যোগ হওয়ায় কোচিং বাণিজ্যের সমাপ্তি ঘটার কথা ছিল কিন্তু তা হয়নি, বরং দিনের পর দিন এ ব্যবসা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংস্থার 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। এই প্রতিবেদনে তথ্য পাওয়া যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গত বছর দেশের ৮৬.৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয়েছে। আর ৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং ছিল বাধ্যতামূলক। ওই প্রতিবেদনে সমাপনী পরীক্ষা ঘিরে কয়েক ডজন অনিয়মের তথ্য উঠে আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পরীক্ষাকেন্দ্রে আসনবিন্যাসে অনিয়ম, কেন্দ্র পরিদর্শকদের মুঠোফোনে বাইরে থেকে উত্তর সরবরাহ করা, প্রশ্নের উত্তর মুখে ও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়া, একজনের উত্তর অন্যজনকে দেখার সুযোগ করে দেওয়াসহ অসংখ্য অভিযোগ প্রতিবেদনে স্থান পায়। এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিও উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। উল্লিখিত সব অভিযোগই মানসম্মত শিক্ষার পথে বিরাট অন্তরায় এবং গোটা শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রচণ্ড হুমকিস্বরূপ। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক দিন যোগাযোগ ছিল না। যখন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম, তখন এক-আধটু আগ্রহ ছিল। সম্প্রতি একটু সংযোগ রাখলাম, তাতে বেশ হতাশই হচ্ছি। বছর শুরুতে উদ্বিগ্ন হয়েছি, যখন রবীন্দ্রনাথ, নজরুলসহ অনেকের লেখা হেফাজত ইসলামের কথায় পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়েছে। এ নিয়ে প্রগতিশীলদের ভেতর থেকে জোরালো প্রতিবাদ চলছে।

তা ছাড়া অনেক দিন থেকে সৃজনশীল পড়ালেখার নামে কী পড়ানো হচ্ছে, এ প্রশ্নটি নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক স্তরে নানা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা এখন ঢের উপস্থিত। একদিকে আগ্রাসী নিওলিবারেল বিচ্ছিন্নতার দর্শন ও রক্ষণশীল পশ্চাৎপদ দর্শন সৃষ্টি করছে করপোরেট পুঁজির অনুগত ভোগবাদী মানুষ, অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে তা মৌলবাদী চিন্তা ও দর্শনের বিপরীতে মুক্তচিন্তা-মুক্তবিকাশে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। কয়েক বছর ধরে নিরপরাধ কোমলমতি শিশুদের ওপর গবেষণার গিনিপিগ বানানোর চেষ্টা চলছে। এত পরিবর্তন-এক্সপেরিমেন্টের জন্য মানসিক সমর্থ নয়।

বিশ্বের সেরা শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত ফিনল্যান্ডের স্কুলে যখন প্রথম ৬ বছর কোনো পরীক্ষা হয় না এবং ১০ বছরের স্কুলজীবন শেষে প্রথম বড় ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তখন বাংলাদেশে ফার্স্ট টার্ম, মিড টার্ম, বার্ষিক, পিইসি, জেএসসি, এসএসসির মতো কত পরীক্ষার মুখে শিশুদের মুখোমুখি করে দেওয়া হয়, যা তাদের কিছু শেখার আগেই প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেয়। জাপান ও কোরিয়ায় যখন ম্যাথ এবং প্রবলেম সলভিংয়ের ওপর ফোকাস করে ধীরে ধীরে শিশুদের বড় করা হয় তখন আমাদের শিশুদের মুখস্থ করার যুদ্ধে নামতে হয়। জার্মানিতে শিশুদের স্কুলের প্রথম দিন যখন শিক্ষাসামগ্রীর সঙ্গে খেলনা, ফুল ও মিষ্টান্ন সংবলিত 'স্কুল কোণ' নামক বিশেষ উপহার দেওয়া হয় তখন আমাদের স্কুলে লম্বা বইয়ের লিস্ট ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্য একজনকে এই ভারী বইয়ের ব্যাগ বহন করে স্কুলে দিয়ে আসতে হয়। সৃজনশীল পদ্ধতিতে যে পরিমাণ দক্ষতা প্রয়োজন, তা দিতে রাষ্ট্রযন্ত্র অনেকটাই অকার্যকর। অনেক জায়গায় দেখেছি, সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক শিক্ষকেরই ধারণা কম। তারা নিজেরাও স্পষ্ট নন এ পদ্ধতি সম্পর্কে। সেখানে তারা শিক্ষার্থীদের কী পাঠদান করবেন! বছরে তিন-চারবার পরীক্ষা পদ্ধতি, সৃজনশীলের সংখ্যা, পরীক্ষার সময় কিংবা সিলেবাস বদল করে বারবার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিপদে রাখা হয়েছে। সারা বছরই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। তাতে করে ভালো কিছু হচ্ছে, তারও উদাহরণ নেই।

শিক্ষার মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি নিয়ে এ শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের ছেলেমেয়েরা কী শিখবে? তাদের স্বপ্ন দেখায় না, তাদের সৃষ্টিশীল করছে না

একাডেমিক শিক্ষার চাপ লাঘবে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়েও সিঙ্গাপুর বিশ্বের অন্যতম সেরা শিক্ষাব্যবস্থার অধিকারী। যেখানে আমাদের দেশে খেলার মাঠবিহীন, ছোট ছোট আবদ্ধ ফ্ল্যাটে অনেক শিক্ষার্থী প্রাণহীন শিক্ষা গলাধঃকরণ করছে। পড়ার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। কোনো মজা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। বাংলা বই হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানের মতো। সেখানে সাহিত্যের ছোঁয়া অনুপস্থিত। আমাদের শিক্ষায় মানবিকতা, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, নান্দনিকতা ও আনন্দযোগের অভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'আমরা যতই বিএ, এমএ পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ব হইতেছে না। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি, আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।' [illegible] হিসেবে তিনি বলেছেন, 'বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, আহারটি রীতিমতো হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। আচ্ছা, মেনে নিলাম, একটা পাঠ্যপুস্তক তো আছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সেখান থেকে অনুসরণ করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা না করে পরীক্ষার্থীদের কাছে বানান ভুলসহ গাইড বই অনুসরণ করা প্রশ্নপত্র দেওয়া হচ্ছে। যেখানে শিক্ষা হওয়া উচিত আনন্দময়, সেখানে পরীক্ষার্থীদের কাঁদতে কাঁদতে পরীক্ষা হল থেকে বের হতে হচ্ছে। অনেক অভিভাবকের ধারণা, সৃজনশীল মানে গাইড বই। পাঠ্যবই থেকে ৩০% আর গাইড থেকে ৭০% প্রশ্ন। একজন অভিভাবক বলেছেন, আমি আমার মেয়েকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত গাইড বই ছাড়া পড়াইছি। স্কুল থেকে সব প্রশ্নের উত্তর নোট করে দিয়েছে মেইন বই থেকেই। এখন পঞ্চম শ্রেণিতে এ স্কুলই বলছে গাইড বই কিনে পড়তে! কারণ মেইন বইতে কিছুই নেই। শিক্ষার্থীদের সব সময় গোলকধাঁধায় রাখা হচ্ছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ আর দুশ্চিন্তায় থাকেন। বইগুলো খুললেই অভিভাবকরা মাথায় হাত রাখেন, কী পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন।

শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হলো জাতির ভিত্তিপ্রস্তর প্রস্তুত করা। জাতিকে কেমনভাবে দেখতে চাই তা নির্ভর করে ভিত্তিপ্রস্তর কেমন তার ওপর। কোনো জাতির ভিত্তি যদি মজবুত না হয়, তাহলে জাতিকে যথাযথ এবং উপযুক্ত করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ভিত্তিপ্রস্তর মজবুত করতে গিয়ে তা দুর্বল হয়ে গেলে, তা বুমেরাং হওয়ার বিপত্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে। লক্ষ করা যায়, শিশুদের প্রতিনিয়ত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার উৎকর্ষের পরিবর্তে প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টির নামান্তর হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের মাধ্যমে যথাযথ শিশুর বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে জাতিকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেওয়া উচিত। আমাদের দেশে শিক্ষাটা আসলে কী! গাইড বই প্রকাশকদের ধনিক শ্রেণিতে রূপান্তর করার জন্য এ ব্যবস্থা? মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থক ধনিক শ্রেণির শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি ও দর্শনই প্রতিফলিত হচ্ছে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে। সৃজনশীল চালু করে শিক্ষার্থীদের আরও বেশি নোটবই আর কোচিংনির্ভর করা হয়েছে। কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি, কোচিং সেন্টার বন্ধ করার ব্যাপারে সরকার বেশ কঠোর। কয়েকদিন শিক্ষামন্ত্রী বেশ উচ্চবাচ্য করেছেন। কিন্তু একটা কোচিং সেন্টারও বন্ধ হতে শোনা যায়নি। বরং এর সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে। গ্রাম কী, শহর কী সব জায়গায় এখন কোচিং সেন্টার বাণিজ্য। ওখানে এদের উপস্থিতি দেখলে মনে হয় অনেকটা অনিচ্ছায় শিশুগুলো স্কুলে যাচ্ছে। ওদের পড়ালেখা তো কোচিং সেন্টার ও গাইড বইনির্ভর হয়ে উঠছে। প্রাথমিক শিক্ষার শুরু থেকে অসংখ্য গাইড বইয়ে সয়লাব। কোচিং মানেও গাইড বই। একেকটা কোচিং সেন্টার গাইড বই ফ্রি দিচ্ছে। এই গাইড বই পড়ে মুখস্থ করো। আর সাপ্তাহিক পরীক্ষা দাও। প্রথম শ্রেণির শিশুর হাতে এখন গাইড বই! আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময়ও গাইড বইয়ের ওপর খুব একটা নির্ভর ছিলাম না। কী হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থায়? শিক্ষার মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি নিয়ে এ শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের ছেলেমেয়েরা কী শিখবে? তাদের স্বপ্ন দেখায় না, তাদের সৃষ্টিশীল করছে না। তৈরি করছে একটি হতাশ ও ক্লান্ত প্রজন্ম, যে প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষা থেকে বাধ্য হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

❑ রায়হান আহমেদ : কলাম লেখক